Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-2 January 2026

বর্ধমান জেলার অনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামের কাহিনি

সর্বজিৎ যশ

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/1_Sarbajit-Yash.pdf

সারসংক্ষেপ: রাজনীতির জটিল আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পেছনে বহু সংগ্রামশীল মানুষের অবদান রয়েছে। জেলায় জেলায় মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তার মধ্যে কিছু মানুষ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেও বহু মানুষ স্বাধীনতার লড়াইয়ে যুক্ত থাকলেও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। বর্তমান প্রবন্ধে বর্ধমান জেলার এরকমই অনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বধীনতার লড়াইয়ের কাহিনি আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রাজনীতি, বর্ধমান জেলা, স্বাধীনতা, পৌরসভা, ভারতসভা, মহাবিদ্রোহ

বর্ধমান জেলায় আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেক্ষেত্রে ১৮৫৫র সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এখানে বলে রাখা ভালো এই দুই বিদ্রোহের সময়েই বর্ধমান মহারাজ মহাতাবচাঁদের (১৮৩২-৭৯খ্রিস্টাব্দ) ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। W. W Hunter এর 'Annals of Rural Bengal' থেকে জানা যায় মুর্শিদাবাদের জমিদার, বীরভূমের জমিদার ও বর্ধমান বিভাগের নীলকরগণ সৈন্য ও হস্তি দিয়ে সরকারকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিল। একই সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ ইংরেজ সামরিক বাহিনীকে রসদ, যানবাহন দিয়ে সাহায্য করে, ইংরেজ কোম্পানিকে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। একইভাবে ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের সময়েও মহাতাবচাঁদ বিদ্রোহ দমনকরণার্থে ইংরেজ সরকারকে হস্তি, যানবাহন দিয়ে, বর্ধমান থেকে বীরভূম এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথ উন্মুক্ত রেখে সিপাহিদের আন্দোলন সম্পর্কে ইংরেজ কোম্পানির আধিকারিকদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে বর্ধমানরাজ দুটি স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহকে দমন করতে সাহায্য করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মদত জুগিয়েছিলেন। লন্ডনের 'Times' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার জন্য মহাতাবচাঁদ ইংরেজ সরকারকে ৫লক্ষ পাউণ্ড অর্থদান করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজ-সহ বেশ কিছু এদেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষ ইংরেজদের সাফল্যের জন্য বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই কারণে বর্ধমান রাজবংশ শাসিত অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথমদিকে দানা বাঁধতে পারেনি। পরবর্তীকালে এদেশীয়রা ধীরে ধীরে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকলে এই জেলাতেও স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে।

পৌরসভা গঠন

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পৌরসভার ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন ইউরোপীয়ান। পৌরপতি ও উপ-পৌরপতির পদ ইউরোপীয়ানদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচন আইন পাশ হওয়ার ফলে সাধারণ নাগরিকগণ আংশিক ভোটাধিকার লাভ করে। এইসময় বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি ছিলেন ই.এইচ.হুইনফিল্ড আর উপ-পৌরপতি ই.এইচ.রাডক। বর্ধমানের ১০৪৫ জন নাগরিক নির্বাচনের অধিকার চেয়ে পৌরপতির নিকট আবেদন করেন। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্বাক্ষরকারী ছিলেন মহারাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর। একমাত্র তাঁর স্বাক্ষরের গুরুত্বেই নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার লাভ বর্ধমানের সাধারণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

ভারতসভা গঠন

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'Indian Association' বা 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণকে একই রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করা। এই ভারতসভার প্রভাবে বর্ধমানে উদারপন্থী রাজনীতির পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। বর্ধমান শহরে, কালনায় ও পূর্বস্থলীতে ভারতসভার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ রাজনীতির সূচনা করে। এর ফলে জমিদার, জোতদার ও সরকারি শাসকের মধ্যে একটা যোগসূত্র দ্বারা দাবি উত্থাপনের সোপান তৈরি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নলিনাক্ষ বসু, জগবন্ধু মিত্র, মৌলবি মহম্মদ ইয়াসিন ও আবুল কাশেমের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বর্ধমানে এলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' পত্রিকার সূত্রপাত ঘটে। এই পত্রিকা রায়তদের দুর্দশা ও জমিদারদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরতে থাকে।

১৮৮৫: ভারতীয় রাজনীতির জলবিভাজিকা

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে বর্ধমানের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না, এমনকি এইসময় বর্ধমানে জাতীয় কংগ্রেসের কোনো অফিস বা শাখা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্ধমান জেলায় শাখা তৈরি হয় ২৫ বছর পরে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। অন্যদিকে একই বছরে (১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ) ডিসেম্বরে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তাতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, আমির আলির সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন মিলিত হয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়, তাতে দ্বারভাঙার মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রমুখ বহু জমিদার ও অভিজাত মানুষ যোগদান করেন, কিন্তু বর্ধমানের মহারাজ এই সম্মেলনে যোগদান করেননি। বর্ধমানে ১৮৯৯ ও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভা হয়। সম্ভবত বর্ধমানে এই সংগঠনের কোনো শাখা ছিল, কিন্তু তার সঠিক সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এই সম্মেলনগুলিতে ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় বাড়তে শুরু করে, প্রমাণ করে এই জেলার মানুষ ক্রমশ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছেন।

১

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গ: বড়লাট লর্ড কার্জনকে বর্ধমানের মহারাজধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর বর্ধমানে আসার আমন্ত্রণ জানালে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট বর্ধমানে আসেন। লর্ড কার্জনের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে মহারাজ বিজয়চাঁদ একটি তোরণ নির্মাণ করান, যার নাম 'Star of India'। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যা 'বিজয় তোরণ' নামে পরিচিত। এছাড়াও তিনি বর্ধমান রাজ অতিথি নিবাসের (বর্তমানে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর) বাগানে সামরিক পোশাক পরিহিত সাত ফুট দৈর্ঘ্যের লর্ড কার্জনের একটি দণ্ডায়মান শ্বেত পাথরের মূর্তি স্থাপন করেন, যা বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রক্ষিত। এছাড়াও ভৈরবচন্দ্র নাগকে দিয়ে তৈরি করান বিশেষ মিষ্টান্ন সীতাভোগ ও মিহিদানা। তবে একই বছরে, অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলায় প্রখ্যাত আইন বিশারদ বর্ধমান জেলার সুসন্তান স্যার রাসবিহারী ঘোষ কলকাতার টাউন হলে বিলাতি মিথ্যাবাদিত্ব ও ভারতীয় মিথ্যাবাদিত্ব সম্বন্ধে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন।

১৯০৫এ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হলে সারাবাংলা আন্দোলনে ফেটে পড়লে মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন। এই জেলার মানুষ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার মানুষ আরো রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল পরিচালিত হয়। বর্ধমানের বহুস্থানে রাখিবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। মেমারিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন আবুল কাশেম। কালনায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ নাগ, উপেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে কালনার মহিষমর্দিনীতলায় যে প্রতিবাদ সভা হয়, সেখানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবুল কাশেম বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে ধিক্কার জানিয়ে জোরালো বক্তৃতা করেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ললিতমোহন ঘোষাল, গীতপতি কাব্যতীর্থ, উপেন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। একইসঙ্গে শুরু হয়ে যায় বয়কট আন্দোলন। বাঘনাপাড়ায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় (বলাই দেবশর্মা নামে অধিক পরিচিত) ও গৌরগোবিন্দ গোস্বামী এই পাঁচজন ছাত্র বিলাতি কাপড় লুট করে পুড়িয়ে দেয়। এদের পুলিশ এরেস্ট করে নিয়ে যায় এবং এদের শাস্তি হয়, সম্ভবত এরাই ব্রিটিশ রাজত্বকালে বর্ধমান জেলায় প্রথম রাজনৈতিক অপরাধী। অন্যদিকে মানকরের রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত একইভাবে বিলাতি কাপড় পোড়ানোর অপরাধে শাস্তি পান। কোর্টে এই সকল রাজনৈতিক অপরাধীদের পক্ষে সাওয়াল করেন বর্ধমানের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বর্ধমান পৌরসভার প্রথম ভারতীয় পৌরপতি নলিনাক্ষ বসু ও শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়। কাটোয়া, সিঙ্গারকোন, বৈদ্যপুর, অকালপৌষ, ধাত্রীগ্রাম, আনুখাল প্রভৃতি স্থানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনসভা করা হয়।

একইসঙ্গে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। কালনার পাথুরিয়া মহলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বদেশি ভাণ্ডার'খোলেন। শ্যামলাল গোস্বামী স্বদেশি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ও পূর্ণ দত্ত স্বদেশি কাপড় তৈরির তাঁত বসান নিজের খরচে। এইভাবে বয়কট ও স্বদেশি পাশাপাশি চলতে থাকে। এই স্বদেশি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য দান করেন কলকাতার ব্যবসায়ী এবং অকালপৌষ গ্রামের সুসন্তান নরেন্দ্র রক্ষিত ও রমাপতি রায়। এঁদের উৎসাহ দেন কালনার প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অকালপৌষ গ্রামের অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ। এঁদের প্রভাবে আনুখাল, তোলার হাট, রাইগ্রাম, কৈগ্রাম, অকালপৌষ, পাঁচরখি, বৈদ্যপুর, ধাত্রীগ্রামেও স্বদেশি ভাণ্ডার খোলা হয়। কালনা, মন্তেশ্বর ও পূর্বস্থলীতে 'বান্ধব সমিতি', 'মহামায়া সমিতি' নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ব্যায়ামচর্চা ও বিপ্লবী কাজকর্ম চালানো হয়। 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর সমিতি'র শাখা অফিসও খোলা হয়। সাপ্তাহিক 'পল্লিবাসী' পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় — 'বিদ্রোহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর পুলিশ নাকি কালনার বান্ধব সমিতির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। গতবারে বিভাগীয় কমিশনার বহরমপুরের রিপোর্টে এই সমিতির নাম ছিল। গোটা জেলায় বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। চারিদিকে বিলাতী বস্ত্র বর্জন কর্মসূচিতে বিলাতী কাপড় পোড়ানোর হিড়িক পড়ে গেল। বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা মার খেতে লাগল, খরিদ্দার আকর্ষণ করার জন্য বিলাতী কাপড়ের দাম কমাতে বাধ্য হল।'

স্বদেশি আন্দোলনের অপর এক বৈশিষ্ট্য জাতীয় শিক্ষার প্রসার। সেই উদ্দেশ্যে সুবোধ মল্লিক ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়ের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নিয়ন্ত্রণে ও জাতীয় ভাবধারায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বর্ধমান জেলায় প্রমথ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দেব, বলাই দেবশর্মা, স্বামী কমলানন্দ, ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেলায় জাতীয় শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই বিষয়ে অকালপৌষ গ্রামের অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি সরকারি স্কুলের চাকুরি ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

২

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন: মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেনি। ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি করছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে মুসলিম জগতের ধর্মগুরু খলিফাকে গদিচ্যুত করে তুরস্ককে বিভাজন করলে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার কারণ ছিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বর্বরোচিত গণহত্যা এবং তুরস্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক ভূমিকা। ভারতীয়দের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ১৯১৮তে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়, তা ভারতের নেতৃবৃন্দ গ্রাহ্য করেননি। সমগ্র ভারতেই তখন শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

অধিবেশনে 'অসহযোগ' প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্ধমান জেলার প্রতিনিধি হিসেবে এই অধিবেশনে যোগদান করেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও অমরনাথ দত্ত। ভোটাধিক্যে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। নাগপুরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজীর অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কলকাতা ফিরে আসেন এবং কলকাতার ফরবেস ম্যানসনে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যালয় স্থাপিত হয়। এখান থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় যুবক, কর্মী প্রেরিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে সুধীন্দ্রকুমার রায়ের নেতৃত্বে আটজন যুবক বর্ধমান জেলায় প্রেরিত হয় — এঁরা হলেন — ১। ডা: হরিহর সেন (নপাড়া, নাদনঘাট), ২। মরীতি মল্লিক (সাতগড়িয়া, নাদনঘাট), ৩। লালমোহন পালিত (সমুদ্রগড়), ৪। গুণেন সিংহ (কাটোয়া), ৫। নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী (অধুনা ভাটপাড়া), ৬। জগদীশ সেনগুপ্ত (বরিশাল)। বাকি দুইজনের নাম জানা যায় না। তবে সম্ভবত মানকরের বাসিন্দা ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আসানসোলে আসেন তিলক ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য এবং একটি জনসভা করেন। সুধীন্দ্রকুমার রায় আসানসোলে সংগঠন তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মহম্মদ ইয়াসিন, সম্পাদক ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। বর্ধমানের মহারাজ এবং জমিদার শ্রেণি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এই আন্দোলনে তাঁদের কায়েমি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৯১৩-১৯২০ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিনিধিদের খর্বিত এবং ক্ষমতাহীন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে। মধ্যস্থানীয় সম্পন্ন কৃষকগণ এবং শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সর্বদা শতহস্ত দূরে থেকেছেন। অতএব, বর্ধমানে এই ধরনের ব্যাপক গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাফল্য সন্দেহাতীত ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ কাটোয়াতে এসে পৌঁছেছিল। জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের উপর ভার ন্যস্ত হয়েছিল কালনা, কাটোয়া, আসানসোল মহকুমায় কংগ্রেসের আন্দোলন সংগঠিত করার। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা লোকের মনে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। দেখা গেল, ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা সংগঠনের পুরোভাগে যোগ দেন। জমিদার বংশের অন্নদাপ্রসাদ সাহাচৌধুরী বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে আন্দোলনে সামিল হন। সেদিনের তরুণ নিরলস কর্মী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে বাঘনাপাড়ার মুন্সি বাহারুদ্দিন, তমাল সাহা, ক্ষুদিরাম মোদক, বালাকৃষ্ণ কোঙার, সেখ রমজান প্রমুখ যোগ দেন। ফরবেস ম্যানসন থেকে আগত কর্মী গুণেন সিংহ তো ছিলেনই, তাছাড়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী সমাজ সকলেই মাতৃমুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেন। ব্যবসায়ী সমাজের মুখপাত্র নিরঞ্জন মল্লিক ও প্রফুল্ল পাঁজার নাম এই প্রসঙ্গে করতেই হয়। হরেরাম মণ্ডল কাটোয়ার কংগ্রেসের স্তম্ভরূপে দেখা দিলেন। পরবর্তীকালে হরেরাম মণ্ডলের কাটোয়া স্টেশন বাজারের দোকান সকল কংগ্রেস কর্মীর আশ্রয়স্থল ও মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

অন্যান্য মহকুমার মতো কাটোয়াতে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদক হলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এইভাবেই আন্দোলন চলেছিল। কাটোয়ার আন্দোলনের ঢেউ কালনা, পাটুলি, পূর্বস্থলীতে ধাক্কা দেয়। জিতেনবাবুর ওজস্বিনী ভাষণ এই অঞ্চলের যুবসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেলা কংগ্রেস থেকে মৌলবি মহম্মদ ইয়াসিন, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, হর্ষ মুখোপাধ্যায় কাটোয়ায় আসতেন। এইসময় কাটোয়ায় বহু কর্মী আন্দোলনে যোগদান করে। 'বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' বেআইনি বলে ঘোষিত হলে কাটোয়া থেকে পরপর ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক এই বাহিনীতে যোগদান করেন। প্রথম দলের বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, হেমগিরি বিশ্বাস, ক্ষুদিরাম মোদক, রাধাশ্যাম সাহা কলকাতায় গিয়ে গ্রেফতার হন। বহু গ্রামে কংগ্রেসের শাখা ও চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেসের শক্তিকেন্দ্র রূপে দেখা দেয় – পল্লীগ্রামেও কংগ্রেসের শিকড় বিস্তৃত হয়। কেতুগ্রাম থানার বেড়ুগ্রামের বৈষ্ণব দাস ও আমগড়িয়ার রাখাল রায়ের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যে-কাটোয়া জাতীয় আন্দোলনের একটি শক্তিকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার অবস্থা ১৯১৯এ তেমন ছিল না। সেই সময়ের সরকার বিরোধী তেজস্বী নেতা আবুল কাশেম এসেছিলেন একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে।

সেই সভাটি আয়োজন করার লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়েছিল। গঠনকর্মের ভিতর দিয়ে চরকা খদ্দরকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কাটোয়ায় আবার আন্দোলন শুরু হয়। পুরাতন নেতা, কর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বহু নতুন মানুষ এইসময় আন্দোলনে যোগ দেন। যতীশচন্দ্র সিংহ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেফতার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কাটোয়াবাসী বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে দেখেন — হাকিম জেলে গেলেন। অপর একজন মহিলা ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন — তিনি নির্মলা সান্যাল। ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী সুরমা দেবী ও তাঁর পুত্রবধূ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময় দিকে দিকে সংগঠন প্রসারিত হতে থাকে। হরিহর সেন, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার পরিচয়পত্র নিয়ে কালনায় যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লালমোহন পালিত, সুরীতি মল্লিক। তিনজনের হাতে ছিল তিনখানি চরকা। উকিল পূর্ণ দত্ত তাঁদের গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাড়িতেই কয়েকদিন তিন যুবক থেকে যান। পরে সিদ্ধেশ্বরী পাড়ার একটি বাড়িতে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এর কিছুদিন পর কাষ্ঠশালীর রামেন্দুকুমার ভট্টাচার্য তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। সংগঠনের কাজ শুরু হয়। কালনা শহর থেকে তা ক্রমশ গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হতে থাকে। কালনার মহিষমর্দিনীতলায় বর্ধমান থেকে গিয়ে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, মহম্মদ ইয়াসিন, হর্ষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সভা করেন। ফলে দেশপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মহকুমার বৈদ্যপুর, বাদলা, অকালপৌষ, আনুখাল, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম, সিমলন, মন্তেশ্বর, কুসুমগ্রাম, কাইগ্রাম, পুটশুড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে। পুটশুড়ির নরোত্তম চৌধুরী, কাইগ্রামের তীর্থনাথ বসু নিজ নিজ এলাকার নেতৃত্বভার গ্রহণ করে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। এইসব স্থানে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। বৈদ্যপুরের কমিটি ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। হেমন্তকুমার নন্দী ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। রাখালদাস নন্দী, যিনি 'স্বদেশি রাখাল' বলে পরিচিত ছিলেন, তিনি বৈদ্যপুর কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ। বৈদ্যপুরের একটি স্বদেশি ঐতিহ্য আছে। সেকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পাদস্পর্শে বৈদ্যপুর ধন্য হয়েছিল। তাঁদের বক্তৃতায় স্থানীয় জনসাধারণ জেগে উঠেছিল। তাই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন এখানে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আলোড়ন দুর্গাদাস নন্দীকেও চঞ্চল করে তুলেছিল এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন।

জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বৈদ্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে এই বিদ্যালয়টি জাতীয় ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। মিত্র মহাশয় আন্দোলন শুরু হবার কিছুদিন পরে প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন। এই বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য নিত না, তাই স্কুলটির সাহায্য বন্ধ হবার কোনো ভয়ও ছিল না। বিদ্যালয়ে চরকা ও তাঁত ক্লাস খোলা হলো। ছাত্ররা শোভাযাত্রা করত — তিলক ভাণ্ডারের জন্য অর্থভিক্ষা করত। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সীতারাম নন্দী, রামকানাই সামন্ত ও সাধনহরি নন্দী পড়া ছেড়ে আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কলকাতায় গিয়ে কারাবরণ করেন। এই বিদ্যালয়ের একটি বালক ছাত্রের মনে গান্ধীজীর আন্দোলন গভীর রেখাপাত করেছিল, তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। এই বালক আব্দুস সাত্তারের নিবাস ছিল বৈদ্যপুরের পাশে টোলাগ্রামে। তিনি ছিলেন বৈদ্যপুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী হয়েছিলেন।

গান্ধীজীর চরকা কাটার জোয়ার এসেছিল এই অঞ্চলে। কালনার কয়েকটি জায়গায় 'খাদি ভাণ্ডার' স্থাপিত হয়েছিল। চরকা কাটার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন — 'চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন, / বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ।' কালনা নিবাসী মোক্তার উপেন্দ্রনাথ হাজরা ও উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্ত এই অঞ্চলে স্বদেশি কাপড় তৈরির জন্য প্রথম তাঁত প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উল্লেখ্য দাশু চৌধুরীর মোড়ে ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় বিদেশি কাপড় পোড়ানো ছিল সেদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষে বর্ধমান শহরেও সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিরাট মিছিল হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুআরি স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য বর্ধমান-সহ সর্বত্র পাঠ করা হয়।

৩

লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন: গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল ডান্ডি মার্চের মাধ্যমে গুজরাটের সমুদ্র উপকূলে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তখন বর্ধমানে বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী প্রমুখ 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। অতুল ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ শ্রীরামপুর থেকেই কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করতেন। সরোজ মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী বর্ধমানে এসে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 'যুগান্তর' দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ধমানের বেশ কিছু নেতা লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র দেশের গান্ধীবাদীরা গান্ধীজীর অভিযানের অনুকরণে নিজের নিজের এলাকায় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সমবেত হয়ে এইদিনে (৬ এপ্রিল) লবণ আইন ভঙ্গের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ২৪ পরগনা জেলার মহিষবাথান গ্রাম (সল্টলেকের সন্নিকট) এবং মেদিনীপুরের মহিষাদল ও কাঁথিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সত্যাগ্রহীদের এই পদযাত্রায় যোগদানের আহ্বান জানানো হয়।

বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে বর্ধমান জেলা থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গান্ধীবাদী নেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার জীবনে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়টা ছিল যেন অগ্নিপরীক্ষার কাল। সমগ্র বর্ধমান জেলায় এই আন্দোলন জোরদার করে তুলতে হবে — এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অসহযোগ আন্দোলনে বর্ধমান জেলা, বিশেষ করে সদর মহকুমা আদৌ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি — এই অপবাদ এবারে ধুয়ে মুছে ফেলতেই হবে। বাংলাদেশের প্রান্তে তখন নতুন করে বিপ্লবীদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে; চারিদিকে সন্ত্রাসের হাওয়া। এই পরিস্থিতিতে খাঁটি অহিংসবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করাই ছিল দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া, এই আন্দোলন দমনে ইংরেজ সরকারেরই বা কী ভূমিকা ছিল, তাও অজানা। তখন অভিভাবকদের মনে প্রচণ্ড আতঙ্ক। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণটা না খুইয়ে বসে। নতুন সত্যাগ্রহীদের শুধু অহিংসবাদী হলে চলবে না, চরম নির্যাতন সহ্য করার মতো দৈহিক ও মানসিক সামর্থও তাদের থাকতে হবে। সেদিনের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজে বর্ধমান 'গুপ্ত সমিতি'র সদস্যরা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও বিজয় ভট্টাচার্যকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই সমিতির অন্যতম সদস্য বিনয় চৌধুরীকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি অন্যান্যদের সহায়তায় বর্ধমান শহর ও জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজে মেতে ওঠেন। বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে তাঁরা প্রচার করেন। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক কালনা রোড ধরে ২৪ পরগনা জেলার মহিষবাথানে লবণ তৈরির জন্য রওনা হয়। শিবশংকর চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল মেদিনীপুর জেলার কাঁথির ইছাবনীতে যান এবং পুলিশের হাতে খুবই নির্যাতিত হন। বেশ কিছু মানুষ গ্রেফতার হয়ে দমদম জেলে কারাবাস করে। বিনয় চৌধুরীকে এই কারণে গ্রেফতার করে বর্ধমান জেলে রাখা হয়। একইসঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোঙার গ্রেফতার হন। বর্ধমান জেলার প্রায় ২০০ জন এই সময় জেলে ছিলেন। দুর্গাপুরের এক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিন মাসের জন্য এলাকা থেকে বহির্ভূত করা হয়। সুকুমারবাবু, বর্ধমানে এসে বিনয় চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। সরোজ মুখার্জী আসানসোল থেকে গ্রেফতার হন এবং তাঁকে দমদম জেলে পাঠানো হয়। একইসঙ্গে দাশরথি তা-কে গ্রেফতার করে দমদম জেলে পাঠানো হয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের অগস্ট মাসে বেগুট কেসে অভিযুক্ত হয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ৬ বছর সাজা হয় এবং তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য, ধর্মদাস চৌধুরী, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায় প্রমুখ গোপনে কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে তাঁদের অনেকেই গ্রেফতার হন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই সাক্ষ্য জোগাড় করতে না পারায় মুক্তি দিতে হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলা কনফারেন্সে সরোজ মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী প্রমুখ গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করেন এবং সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করেন। খুবই হৈ-চৈ পড়ে যায়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এই সম্মেলনের পরেই বঙ্কিম মুখার্জীর নেতৃত্বে যুব সম্মেলন হয়। এই সময়েই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে 'বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন' হয়। তৎকালীন যে সংগঠনগুলি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত, তারা এতে যোগদান করে। এরপর থেকেই বিনয় চৌধুরী ও সরোজ মুখার্জী বেশ কয়েকমাস 'সাম্য' নামে একটি পত্রিকা চালান। তাঁরা 'যুগান্তর' দল থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান সোসালিস্ট রেভলিউশনারি পার্টি' গঠন করেন। কিছুদিন পর বিজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের উদ্যোগে এই দলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান

রেভলিউশনারি পার্টি'। এইসময় থেকে নেতারা কৃষক সংগঠনের দিকে জোর দেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে হাটগোবিন্দপুরে 'বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন' হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সমসাময়িক কালে দাঁইহাটে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন হয়েছিল। এর মূলে ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র। দাঁইহাটের এই কর্মী সম্মেলন কাটোয়া মহকুমার ইতিহাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বর্ধমানের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা বিপ্লবী ফকিরচন্দ্র রায় এবং তাঁর সহযোগী রানিগঞ্জের ভীমাচরণ রায়, আসানসোলের কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গ জেলাভিত্তিক গুপ্ত ছাত্রসমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনকে কাজে লাগিয়েছিলেন। করজ গ্রামের অশ্বিনী মণ্ডল, সিঙ্গির ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুরচির নিরঞ্জন হাজরা, ওকড়সার বিমলাপতি চৌধুরী, দাঁইহাটের সিদ্ধেশ্বর সাহা, কাটোয়ার শ্যামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া কংগ্রেসের নেতা ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অন্নদাপ্রসাদ সাহাচৌধুরী।

৪

ভারতছাড়ো আন্দোলন: ১৯৪২এর ভারতছাড়ো আন্দোলন বর্ধমান জেলায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এইসময় বিজয় ভট্টাচার্য কলকাতার মানিকতলায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন এবং সেখান থেকেই তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা শুরু করেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন চারুপ্রভা সেনগুপ্ত। ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘেরাও এবং অগ্নিসংযোগ ঘটতে থাকে। বর্ধমানের তিনটি থানা দখলের চেষ্টা হয়। এগুলি হলো — জামালপুর, মন্তেশ্বর ও ভাতার। অবশ্য ভাতার থানা তখন সাহেবগঞ্জে অবস্থিত ছিল। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, সাদিপুর, বেড়ুগ্রাম, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে পোস্ট অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ দামোদরে 'বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে' (বি.ডি.আর) তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। খানা জংশন থেকে গলসি এবং খানা জংশন থেকে ভেদিয়া এলাকার রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। বর্ধমান শহরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অগস্ট বিক্ষোভ মিছিল হয়। বর্ধমান কোর্ট কম্পাউণ্ডে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ হয়। নেতৃত্ব দেন বিজয় ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, গৌরহরি মিত্র, সুবোধ মুখার্জী, অলোক সরকার, শিবকুমার মিত্র, অম্বুজা বসু, নারায়ণদাস হাজরা, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। মিঠাপুকুরে একটা ভাঙা বাড়িতে নিয়মিত বৈঠক হতো। আন্দোলনকারীরা বীরহাটা বাঁকাসেতু উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, যদিও তা ব্যর্থ হয়।

দক্ষিণ দামোদর এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিশোরী কর্মকার, দাশরথি তা, পঞ্চানন তা, জিতেন্দ্র তা, শিবেশ তা, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, ডা. প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ ভুঁইঞা প্রমুখ। সরঞ্জার ডা. প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, কুলে গ্রামের রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সগড়াই ডাকবাংলো পুড়িয়ে দেন। এর ফলে ডা. প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের জেল এবং রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কালনা শহরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনিল ব্যানার্জী, কানাই পান, বিশ্বনাথ সাহা, অনাদি দাস, শক্তিপদ পাণ্ডে, উমাপদ ভাদুড়ী, কৃষ্ণ নায়েক, দেবেন্দ্রবিজয় ঘোষ, পরেশ পোদ্দার, সতীশ পোদ্দার, চপল ব্যানার্জী, ভাস্কর ব্যানার্জী, বৈদ্যনাথ মজুমদার প্রমুখ। কালনা কোর্ট ও স্টেশনে আগুন লাগানো হয়। এর ফলে সরকার ৩০ হাজার টাকা পাইকারি জরিমানা নির্ধারণ করে। কালনা শহরের হরিজন পল্লীর নিকটবর্তী স্থান থেকে অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। বিকেলে প্রায় দেড় হাজার মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হন। পাথুরিয়া মহলের গাঙ্গুলি বাড়িতে তখন 'গিরিবালা বস্ত্রালয়' নামে একটি কাপড়ের দোকান ছিল। ওই দোকানের মালিক ছিলেন বৃন্দাবনচন্দ্র শেঠ। ওই দোকানের কর্মচারী, বছর ২৫ বয়সের এক যুবক (নাম জানা যায়নি) তেরঙ্গা হাতে নিয়ে ওই বিক্ষুব্ধ মানুষগুলির পুরোভাগে আসে। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহযোগে বিক্ষুব্ধ দলটি কালনা কোর্টের দিকে অগ্রসর হয়। জেলখানায় পৌঁছে জেলখানা ভাঙার উদ্দেশ্যে আসামী ওজন করার হন্দর দিয়ে তালা ভাঙার চেষ্টা চলে। বর্ধমান চারাবাগান নিবাসী শিবুপদ পাণ্ডে এই দলের নেতৃত্ব দেন। এইসময় একজন সিপাহি তালার চাবিটি গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ একটি দল সাহেবদের ফিটন্ গাড়িটিকে ঠেলে গঙ্গার ভাঙনের নিচে ফেলে দেয়। ডিভিসন

বেঞ্চের খড়ের চালা ততক্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। এই আকস্মিক ঘটনায় অন্নদাবাবু জেলখানার দরজার কাছে এসে দু'হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলেন। বিক্ষুব্ধ দলটি সাময়িক শান্ত হলেও পরে তারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে ও বিভিন্ন ঘটনায় সক্রিয় অংশ নেয়। অধুনা নিচেররাস্তায়, তারক শীলের বাড়িতে অবস্থিত পোস্ট অফিসে এরপর একদল মানুষ চড়াও হয়। যথেচ্ছ ভাঙচুর করে ও পোস্ট অফিসের মোহর (পোস্টাল স্ট্যাম্প, সিল) ছিনিয়ে নেয়। হাবু সাহার নাতি বিশ্বনাথ সাহার উদ্যোগে একদল মানুষ ডাকঘরে আগুন লাগায়। সন্ধ্যার সময় তারক শীলের মেজছেলে বঙ্কিম শীল, সিঙ্গি পুকুরের ছুতোর মিস্ত্রি কালীপদ লোহার, স্কুলের ছাত্র শাহজাহান, লক্ষীকান্ত দাস ও জানকীনাথ ঠাকুর-সহ প্রায় দুইশত লোকের একটি বিক্ষুব্ধ দল কালনা রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে ছোটে। সন্ধ্যার পরপরই কালনা স্টেশনে ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। শাহজাহান টেলিফোনের তার কেটে দেয়। কালীপদ লোহার টিকিট জানালার কাঁচ ভেঙে দেয় এবং তাঁর নিজের হাতও কেটে যায়। অন্য কয়েকজনের রেলস্টেশন অবরোধের পরিকল্পনার মধ্যে স্টেশনে জড়ো করা কেরোসিনের টিন আবিষ্কৃত হয় এবং রাত আটটার মধ্যে স্টেশনে আগুন লাগানো হয়। 'বন্দেমাতরম্' ও 'ইংরেজ ভারতছাড়ো' স্লোগানে কালনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ১৪ সেপ্টেম্বরে বর্ধমান সদর থেকে রিজার্ভ ফোর্স কালনায় যায়। ডি.এম., পুলিশ সুপার এবং পুলিশের ডি.আই.জি. এর নেতৃত্বে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। সারা শহরে ভীতি ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। বৈদ্যপুরে ভারতছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নবকুমার রায়, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ বর্ধমান জেলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অর্জন করেনি। তবে এই জেলার ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে প্রভূত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য পূর্বেই আসন্ন ভারতছাড়ো আন্দোলন নিয়ে জেলার গ্রামীণ এলাকায় প্রচারাভিযান চালান। দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হওয়ার অনতিবিলম্বে পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অসীম ঘোষ, নারায়ণদাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেফতার করে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ অগস্ট বর্ধমান শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৭ অগস্ট শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনমিছিল বর্ধমান কোর্টের কাছে উপস্থিত হয় এবং পিকেটিং শুরু করে দেয়। পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্দয়ভাবে লাঠি চালনা করলে কয়েকজন আহত হয়। ইতিমধ্যে শহরের নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা বর্ধমান রেলস্টেশনে আক্রমণ চালায়। ২৬ অগস্ট বর্ধমান কোর্টে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের অফিসের সামনে জনগণ পিকেটিং করে। ২৯ অগস্ট বর্ধমান জেলা বোর্ডের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩, ১৪ সেপ্টেম্বর কালনাতে জনগণ ধর্মঘট পালন করে। ১২ অগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাটোয়াতে ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ১৩ সেপ্টেম্বর কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর জামালপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ভাণ্ডারহাটি ও পলসোনা, ১৩ সেপ্টেম্বর কাশিয়াড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর উচালন ও মণ্ডলগ্রাম ডাকঘরগুলির আসবাব ও নথিপত্র জনগণ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ১৩ সেপ্টেম্বর জনতার আক্রমণে কালনার ডাকবাংলো এবং রেলস্টেশনের দারুণ ক্ষতি হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর কালনার সরকারি আদালতে আন্দোলনের কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ২০ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী জনতা বামুনিয়া দামোদর ক্যানাল অফিস ধ্বংস করে দেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর জামালপুরের পুলিশ থানার আসবাব ও জরুরি নথি, আবগারি দোকান গণআক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ বর্ধমান শহরে জেলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয় এবং ১১ অক্টোবর কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেস কার্যালয় সিল করে দেয়। ৭ অক্টোবর জনগণ সগড়াইয়ের ৭টি শরণার্থী শিবির ধ্বংস করে। ২১ অক্টোবর কুসুমগ্রাম ডাকবাংলো, ২৫ নভেম্বর বেরুগ্রাম ডাকঘর, ২৯ নভেম্বর রায়না ডাকঘর জনরোষে অগ্নিদগ্ধ হয়। তাছাড়া নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বর্ধমানের কয়েকটি অঞ্চলে আরো কয়েকটি অন্তর্ঘাতের ঘটনা ঘটে।

কাটোয়ায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীশচন্দ্র সিংহ, হরেরাম মণ্ডল, মহিমারঞ্জন ঘটক, স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী, কামাখ্যা মজুমদার, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভক্তভূষণ সোম, নিত্যগোপাল সামন্ত, দেবেশ কুণ্ডু, নির্মলানন্দ ঠাকুর

প্রমুখ। গোরাচাঁদ সাহার বাড়িতে একটি গোপন বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সে খবর ছড়িয়ে পড়ায় নেতাজী সুভাষ আশ্রমের কাছাকাছি কোনো একটি বাড়িতে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, বিজয় ভট্টাচার্য, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলোচনা অনুযায়ী কাটোয়ার রেলস্টেশনে আগুন লাগানো হয়। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে কাটোয়া কোর্ট দখলের চেষ্টা হয়। অজয় ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। কাটোয়া থানার পলসোনা গ্রামকে কেন্দ্র করে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ২০-২৫টি ধানের গাড়ি চারজন পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাবার সময় মেঝিয়ারি ও কুরচি গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে আন্দোলনকারীরা ধান লুট করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তেশ্বর গ্রামের ভবানন্দ রায়কে পুলিশ গ্রেফতার করে। পলসোনা গ্রামের ভক্তভূষণ সোম, কালীপদ রায়, নিরঞ্জন রায়, সাতকড়ি সামন্ত, পুটশুড়ির রামনারায়ণ দত্ত, কালনার গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভবানন্দ রায়কে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। ভাতারে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ষষ্ঠী চৌধুরী, ধনঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ। বড়বেলুনে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জলধর মণ্ডল। মন্তেশ্বর থানা এলাকায় এই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, পুটশুড়ি গ্রামের কালীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রভাস চক্রবর্তী, ধর্মদাস মল্লিক, শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রণজিৎ সামন্ত, রমেশচন্দ্র প্রমুখ। করুই গ্রামে দাশরথি তা সভা করেন। পুলিশ আসতে পারে, এই ভেবে আগে থেকেই জায়গার ভুল নাম রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুদপুরে সভা হবে। পুলিশ সুদপুরে পৌঁছে যায়। দাশরথি তা করুইয়ে সভা করে চলে যান।

মানকরের তৎকালীন জমিদার রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমার প্রথম জমিদার, যিনি ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাধাকান্ত দীক্ষিত ছিলেন বর্ধমান জেলার তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা। দুর্গাপুরের টালি কোম্পানির পরিচালক ভোলানাথ রায় ছিলেন দুর্গাপুরের স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তাঁর নেতৃত্বে এখানে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। তিনি কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি স্বদেশি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। গোপালপুর গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রজীবনে বৈপ্লবিক কবিতা লেখার জন্য তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে গোপালপুর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করে স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখানে শিক্ষালাভের সময় যাঁরা স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কুলডিহা গ্রামের সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি। শিক্ষক ও পিতা উভয়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে সুকুমারবাবু কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজে শিক্ষালাভের সময় তিনি ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা। এই সময়ে তিনি রানিগঞ্জের বল্লভপুরস্থিত বেঙ্গল পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার (১৫.১১.৩৮) উক্ত পেপার মিলের শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শ্রমিক ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে উক্ত মিলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. ব্রাউন ভাড়াটে কিছু লোক নিয়ে একটি লরিতে করে আসছিলেন। সেই সময় সুকুমারবাবু সমেত অন্যান্য কর্মীরা এই লরিটি আটক করেন। উক্ত ইঞ্জিনিয়ার এই প্রতিরোধ উপেক্ষা করে গাড়ি চালিয়ে দেন। সুকুমারবাবু ছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে, গাড়িটি তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর রানিগঞ্জের সমস্ত দোকানপাট তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরদিন হরতাল পালন করা হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বল্লভপুরে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটি' কুলডিহায় 'সুকুমার জলাধার প্রকল্প' নির্মাণ করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সহযোগী ছিলেন কুলডিহার শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর এঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীনে স্বদেশি আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন।

সুকুমারবাবুর আর এক সহযোগী ছিলেন ধবনি গ্রামের হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে তাঁর উপর ভার ছিল এই অঞ্চলে মাদকদ্রব্য বর্জন ও বিলাতিদ্রব্য বর্জন নীতি কার্যকর করা। পিকেটিং করার অপরাধে এবং কাঁথিতে 'লবণ আইন' অমান্য করার অপরাধে তিনি একাধিকবার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। স্বাধীনোত্তর আমলে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে) তাঁকে 'তাম্রপত্র' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' ভাতা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। হাজারীলালবাবুর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন কাঁকসা থানার প্যারিগঞ্জের কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়। ধবনি গ্রামের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর একটি স্বাধীনতা আন্দোলনের দল গড়ে ওঠে। এই দলের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে অন্যতম হলেন — নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। এই দলের অন্যতম কাজ ছিল স্বাধীনতার গান গেয়ে প্রভাতফেরি করা এবং মিছিল করা। সদস্যদের মধ্যে কিছু গুপ্ত কাজ-কর্মেরও প্রস্তুতি চলছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক দারোগা খবরটি থানায় জানিয়ে দেন। ফলে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। ভিড়িঙ্গি গ্রামের স্বদেশি আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রামবন্ধু পট্টনায়ক। রামবন্ধুবাবু স্বদেশি ভাবধারায় কাব্যগ্রন্থ ও নাটক রচনা করেন এবং ছাত্রদের অভিনয় করিয়ে ছাত্র ও যুব সমাজে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন।

আসানসোল এলাকায় নেতৃত্ব দেন কালুরাম আগরওয়াল, দুর্গাদাস হালদার, অমূল্যরতন ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রানিগঞ্জ শহরে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন চিরঞ্জীবলাল কেজরিওয়াল। উখরা অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন সুশীল ঘটক, বিমলকুমার বাজপেয়ী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, ভরতচন্দ্র গাঙ্গুলি, অসীম ঘোষ, আশুতোষ মিত্র, বলাই মুখার্জী, নন্দদুলাল গাঙ্গুলি প্রমুখ।

অগস্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৪২এর সেপ্টেম্বর / অক্টোবর থেকে এই আন্দোলন বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় পুরোপুরি জঙ্গি চরিত্র লাভ করে। দিল্লিতে অরুণা আসফ আলি ও সুচেতা কৃপালনির নেতৃত্বে 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠিত হয়। এই সরকারের অধীন সারা বাংলা স্বাধীন সরকারের অধিনায়ক নির্বাচিত হন অন্নদা চৌধুরী। সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জীর পরিচালনায় তমলুকের চারটি থানায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজস্ব গেরিলা বাহিনী, সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগ, বিচার ও শাসন বিভাগ, আর্তদের সেবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ এবং নিজস্ব বুলেটিন, ডাক ও অর্থদপ্তর নিয়ে গঠিত তমলুক জাতীয় সরকারের কাজকর্ম সারা বাংলায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্ধমান জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচি রূপায়ণে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা বিজয় ভট্টাচার্যের আহ্বানে কলকাতার শক্তি প্রেসে রায়নার দাশরথি তা, শক্তি মল্লিক, কালনার ভক্ত রায়, গৌরগোপাল সরকার, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ভবানন্দ রায়, কাটোয়ার ভক্তভূষণ সোম, বিভূতিভূষণ দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সমগ্র বর্ধমান জেলার জন্য একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য ছিলেন এর মুখ্য নির্দেশক। জেলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শক্তি মল্লিক, সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকায় গৌরগোপাল সরকার, ফিল্ডে সর্বাধিনায়ক রায়নার দাশরথি তা, প্রতি মহকুমার জন্য নির্বাচিত হয় দু'জন করে অধিনায়ক। কাটোয়া মহকুমার জন্য ঠিক হয় সিভিলে বিভূতিভূষণ দত্ত এবং ফিল্ড অ্যাকসনে ভক্তভূষণ সোমের নাম। সদর মহকুমার জন্য মনোনীত হন রাধারমণ সেন, কালনা মহকুমার জন্য ভক্ত রায় ও গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। ঠিক হয় কাটোয়া মহকুমায় বিভূতিভূষণ দত্ত গ্রেফতারি বরণ করলে ভক্তভূষণ সোম হবেন মহকুমার অধিকর্তা। আরো ঠিক হয়, ভবানন্দ রায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। প্রত্যেকে বিপ্লবী ছদ্মনামে নিজ নিজ এলাকায় 'মুক্তাঞ্চল' ঘোষণা করে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে গ্রেফতারি এড়িয়ে সংগ্রাম পরিষদের কাজ চালিয়ে যাবেন। কাটোয়া মহকুমার জন্য কাটোয়া থানার পলসোনা এবং কেতুগ্রামের মাসুন্দি হলো গোপন যোগাযোগ কেন্দ্র। বুলেটিন ছাপানোর জন্য সংগৃহীত হয় সাইক্লোস্টাইল মেসিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম। অনেকের মতে পলসোনা থেকে যে বুলেটিন ছাপানো হতো, তার সাজসরঞ্জাম নাকি কাটোয়া লোকাল বোর্ডের অফিস ভেঙে

সংগৃহীত হয়। বর্ধমানে শুরু হলো নিয়মিত 'সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহ' প্রকাশনার কাজ। ছদ্মনামে কাজ চালাতে লাগলেন এডিটর বিমল কুণ্ডু, ব্যবস্থাপক শক্তি ঘোষ, প্রিন্টার শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্যাশিয়ার হৃষিকেশ মণ্ডল। 'এককড়ি রায়' (বা 'একদা') ছদ্মনামে ভবানন্দ রায় হলেন নিয়মিত কালনা কাটোয়ার সংবাদ সংগ্রাহক। তমলুক ও কলকাতার মধ্যে গোপনে বুলেটিন সরবরাহ এবং কলকাতায় বর্ধমান জেলার সংযোগ কেন্দ্রের অধিকর্ত্রী রমা চৌধুরীর (রমারানি তা-র ছদ্মনাম) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল। কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে মুক্তাঞ্চল সরকারের জন্য মাসে মাসে এককালীন টাকার ব্যবস্থাও হয়। তমলুকের মতো বর্ধমান জেলারও কিছু কিছু অঞ্চল স্বাধীন মুক্তাঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশেও ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশির নামে গ্রামবাসীদের ওপর শুরু হয় অকথ্য পুলিশি নির্যাতন। কালনার অ্যাকসনের পর জামালপুর, ভাতার প্রভৃতি থানা দখলকে কেন্দ্র করে পুটশুড়ি সমেত কালনা মহকুমার বিভিন্ন এলাকা, জামালপুরের মণ্ডলগ্রাম, রায়না প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণের ওপর পাইকারি হারে জরিমানা আদায় করা হয়। পুলিশি অত্যাচারের ফলে এলাকার জনগণ বিপ্লবীদের সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবীদের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা এবং আত্মগোপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২এর অক্টোবরের প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা ও ঝঞ্ঝা) মুক্তাঞ্চল সরকারের পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয়। সমস্ত বিপ্লবীদের আপাতত রিলিফের কাজে লাগিয়ে যেমন জনগণের আস্থা অর্জন ও আত্মগোপন সম্ভব হয়, তেমনি মুক্তাঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা চলতে থাকে। বর্ধমান সদর ও কালনা এলাকায় বিপ্লবীদের কাজকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ায় সর্বসম্মতিক্রমে নিরীহ স্কুল মাস্টারের আবরণে ভক্তভূষণ সোমকে অধিনায়ক নির্বাচন করে মুক্তাঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। কড়ুই, গিধগ্রাম, সিঙ্গি, শ্রীবাটি — এই চারটি ইউনিয়নকে মন্তেশ্বরের ধেনুয়া, গলাতুন এবং পূর্বস্থলী থানার কিয়দংশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মুক্তাঞ্চলের নতুন সীমানা গঠিত হয়। উক্ত অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং সে সময়ে কাটোয়ার মহকুমা শাসক বিপ্লবীদের কাজকর্মে আপাতত কোনো বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন না — এই সুযোগে, অঞ্চলটি আদর্শ স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভক্তভূষণ সোমের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, এই সময় থেকেই কাটোয়া থানার পলসোনা গ্রামই হয় বর্ধমান জেলার সর্বাধিনায়কের নতুন হেড কোয়ার্টার।

দাশরথি তা-র কলকাতায় আত্মগোপনের পর কাটোয়া এবং মন্তেশ্বর থানার বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত মুক্তাঞ্চলের কর্মীরা পলসোনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাজকর্ম শুরু করেন। এতদুপলক্ষে কর্মীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যক্ষ 'অ্যাকসনে' রইলেন গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণ দত্ত, অচ্যুতানন্দ চৌধুরী, গোলক রায়, মণি চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব তা, কালিদাস রায় প্রমুখ। দ্বিতীয় দলে ভবানন্দ রায় (প্রচার ও সংযোজক), শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি দত্ত, ধর্মদাস সেন, মহানন্দ সোম প্রভৃতি, তৃতীয় দলে কুরচির হৃষিকেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে রিলিফ ও জনসেবার দায়িত্বে গোবিন্দ সরকার, দেবেন কুণ্ডু, শক্তি ঘোষ, নরহরি হোড়, সুধীর রায়, সদানন্দ রায়, গুহক ঘোষ, অরবিন্দ মুখার্জী প্রমুখ। প্রচ্ছন্ন সহযোগী হিসাবে ছিলেন কড়ুইয়ের তৎকালীন পোস্টমাস্টার সবিতা রায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে কড়ুইয়ের নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে কেনারাম পণ্ডিত), কালী চক্রবর্তী (গিধগ্রাম), দেবনারায়ণ অধিকারী (শ্রীবাটী), রাধিকা মাস্টার (কুয়ারা), রামরঞ্জন পাঁজা (পোস্টমাস্টার, জামড়া) প্রভৃতি। মুক্তাঞ্চলের কর্মীগণ ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের মতো গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুখ্যত আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ধরনের কাজ প্রকারান্তরে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতারই নামান্তর। তাই কেন্দ্রীয় নির্দেশে মুক্তাঞ্চলের বিপ্লবীরা যতদূর সম্ভব নিজ এলাকার বাইরে ব্রিটিশ বিরোধী 'অ্যাকসনে' হাত দিলেন। নাশকতামূলক কাজকর্মে তমলুক ও আরামবাগকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে — এই ছিল তাঁদের মনোবাসনা। এতদুদ্দেশ্যে পলসোনার শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'প্রত্যক্ষ অ্যাকসন'এর পরিকল্পনা রচিত হলো। শ্রীখণ্ড বড়ডাঙার মেলায় লোক জমায়েতের সুযোগে শ্রীখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সরকারি সংস্থাগুলির ওপর একসঙ্গে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত হয়। সেসময় কড়ুই এলাকা ছিল মোটামুটি নিরুপদ্রব এলাকা। ঠিক হলো,

বিপ্লবীরা নিজ নিজ কর্তব্য সমাধা করে প্রয়োজনবোধে কড়ুইয়ের বহিরাগত শিক্ষিকা মনোরমা খাঁ, পোস্টমাস্টার সবিতা রায় এবং প্রাথমিক শিক্ষক নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ বিরোধী না হলেও, এঁরা ছিলেন মুক্তাঞ্চলের বিপ্লবীদের সমর্থক, বিপদের দিনে বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা।

১৯৪২এর অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রি। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙার মেলা সবে জমে উঠেছে। মধ্যরাত্রিতে শুরু হলো বিপ্লবীদের ডাইরেক্ট অ্যাকসন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল মঙ্গালকোট থানার বাজার বনকাপাসী ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ সালিশী বোর্ড, আবগারি দোকান ও শ্রীখণ্ড ডাকবাংলো। লুঠ হলো শ্রীখণ্ড পোস্ট অফিস। বিপ্লবীদের এই কাজকর্ম পুলিশ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। ফলে এই অ্যাকসনে আপাতত কোনো বিপ্লবী ধরা পড়লেন না। খবরটা সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে প্রকাশিত হতেই মুক্তাঞ্চলের কর্মীদের মনোবল বেড়ে গেল। ইতিপূর্বে প্রথম পর্যায়ের অ্যাকসনে তাঁরা ব্যর্থ হলেও, এবারের সাফল্যে তাঁরা সত্যিই গর্বিত। এখন থেকে সংবাদপত্রের পাতায় কোন্ অঞ্চলের নাম সর্বাগ্রে স্থান পাবে, সেই নিয়েই শুরু হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ভারতছাড়ো আন্দোলনে মহিলারাও ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুরমা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা সান্যাল, রমারানি তা প্রমুখ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমান জেলার নারী জাগরণের পথিকৃৎ সুরমা মুখোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার জননেতা ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। স্বামীর সাহচার্যে সুরমা দেবীর মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার আদর্শ সঞ্চারিত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত স্বামীকে গৃহান্তরালে স্বদেশীয় কাজে সহযোগিতা করলেও, ১৯৩০এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৩০এর জুন মাসে 'কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহকুমার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে এই সমিতির অবদান অসামান্য। অগ্নিকন্যা নির্মলা ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার এক স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঝাউডাঙা নিবাসী ভোলানাথ সান্যালের সহধর্মিণী ছিলেন তিনি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় তিনি কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতির সহ-সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩০এর আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমায় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত প্রতিটি শোভাযাত্রা, পিকেটিং ও জনসমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের মহিলা সমিতিতে তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পুলিশি নিষেধাজ্ঞা অবমাননার দায়ে তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই সময় বর্ধমান জেলা থেকেও তাঁকে বহিস্কারের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বহরমপুর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে নির্মলা সান্যাল তাঁর সহজ বাগ্মিতায় সম্মেলনে উপস্থিত স্বাধীনতা কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ কাটোয়া থানা দখলের অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩৩এর ৯ সেপ্টেম্বর হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাটগোবিন্দপুরে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির যে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়, নির্মলা সান্যাল ছিলেন তার একমাত্র মহিলা সদস্যা। আর এক নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী রমারানি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর কুকুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় বিপ্লবী দাশরথি তা-র। কলকাতায় আহিরিটোলায় মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে স্বামীর সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকতেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার বিপ্লবীরা এই বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। রমারানি তাঁদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। দাশরথি সম্পাদিত 'দামোদর' পত্রিকা প্রকাশের পর বিপ্লবীদের হাতে দিয়ে তা বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন রমারানি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রায়না থানার আনগুনা গ্রামে মহিলা বিপ্লবীদের সভা হয়, তাতে সম্পাদিকার কাজ করেন রমারানি। ১৯৪২এর আন্দোলনে খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানার বিপ্লবীরা দক্ষিণ দামোদর জাতীয় সরকার গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তার পুরোভাগে ছিলেন রমারানি ও দাশরথি। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রমারানির মৃত্যু হয়। এছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রমী হলেন — গোলাপসুন্দরী দেবী, কুঞ্জনলিনী দাসী, হেমনলিনী দেবী, গিরিবালা দেবী, সরোজবাসিনী চৌধুরানী, অনিলা দেবী, কিরণবালা দেবী, বাসন্তীবালা দেবী, সিন্ধুবালা দেবী, মনোরমা দেবী,

যোগমায়া দেবী, বিধুমুখী সরকার, সরলবালা বর্মানী, সরোজিনী দেবী প্রমুখ। এছাড়া বহু আন্দোলনকারী গ্রেফতার হন, উল্লেখযোগ্য নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অম্বুজাভূষণ বসু, প্রাণতোষ বসু, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরগোপাল সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, আব্দুস সাত্তার, ফকিরচন্দ্র রায়, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল প্রমুখ।

রাজনীতির জটিল আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনীতি বড়োই মজার বিষয়। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে — ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে বর্ধমানের মহারাজ কুমার উদয়চাঁদ মহাতাব কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করে বিজয় লাভ করেন। বিজয় ভট্টাচার্য এরপর রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণ করে কলানবগ্রামে শিক্ষা নিকেতন গড়ে তোলায় মনোযোগ দেন। অন্যদিকে উদয়চাঁদ ১৯৫২র সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হন। তাই স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরের বর্ধমানের রাজনীতি পুরোপুরি ভিন্ন মাত্রার।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০০১

২. গোপীকান্ত কোঙার, কিশোরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমান', কলকাতা, ২০১৪

৩. তরুণ ভট্টাচার্য, 'কালনার ইতিহাস', কালনা, ১৯৯৬

৪. নারায়ণ চৌধুরী, 'জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান', বর্ধমান, ১৯৯৬

৫. প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি : তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক', কলকাতা, ২০০৭

৬. ফকিরচন্দ্র রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্ধমান', প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮ দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৬

৭. বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা', কলকাতা, ২০০৪

৮. বিপিন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', কলকাতা, ১৯৯২

৯. বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন পানিক্কর, সুচেতা মহাজন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', কলকাতা, ১৯৯৪

১০. মানবেন্দ্র পাল, 'কালনার স্বাধীনতা আন্দোলন যতটুকু দেখেছি', অম্বুকণ্ঠ, একবিংশ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪০৪

১১. রতনলাল দত্ত, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের দিক দিগন্ত : পটভূমি বর্ধমান', বর্ধমান, ২০১১

১২. সর্বজিৎ যশ, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, 'ফিরে দেখা বর্ধমান', বর্ধমান, ২০১৯

১৪. সর্বজিৎ যশ ও অনির্বাণ বিশ্বাস সম্পাদিত, 'বর্ধমান পৌর উৎসব স্মরণিকা', ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭

১৪. সর্বজিৎ যশ, 'বর্ধমান জেলায় গান্ধী পরিচালিত গণআন্দোলন সমূহের প্রতিক্রিয়া', মূলগ্রন্থ: 'মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', সম্পাদনা দেবব্রত ঘোষ, কলকাতা, ২০১৮

লেখক পরিচিতি: সর্বজিৎ যশ, সহকারী অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন, গ্রন্থ প্রণেতা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।